ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505 VOL-I, ISSUE-II (Jul-Dec 2025)

কলকাতার জনবিন্যাসের রূপরেখা ও বসতি বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)

ড. কেকা ত্রিবেদী
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ
kekatrivedisengupta@gmail.com

Submitted on: 12.12.2025
Accepted on: 25.12.2025

সংক্ষিপ্তসার- জনপদ হিসাবে কলকাতার অস্তিত্ব বহু পুরোনো হলেও শহর কলকাতা গড়ে ওঠে ১৭ শতকের শেষ ভাগ থেকে ব্রিটিশদের হাত ধরে। নগরায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কলকাতা শহর প্রথম থেকেই পশ্চিমে হুগলি নদী ও পূর্বে জলাভূমির বাধার জন্য রৈখিক জনবসতি হিসেবে উত্তর- দক্ষিণে বিস্তৃত। তবে শহরের অভ্যন্তরীণ নকশা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল আড়াইশো বছর ধরে। প্রথমদিকে কলকাতাকে ইংরেজ শাসকরা ঔপনিবেশিক ধাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ফলে শহরের মেরুকরণ হয় জাতি বৈষম্যের ভিত্তিতে। ১৮ শতকেই কলকাতা হোয়াইট টাউন (White Town) ও ব্ল্যাক টাউন (Black Town) এ বিভাজিত হয়। কলকাতার প্রকৃত নগরায়ন হয় ১৯ শতকের গোড়ায়। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও জনসংখ্যার চাপে শহরের জনবিন্যাসে পরিবর্তন আসে। ১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতার বসতি বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে শহরের সীমানা বারবার সম্প্রসারণ ও জমির ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে কলকাতা অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও আসলে একটি আবাসিক শহর। নগরায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে মোট ভূমিভাগের অর্ধেক ব্যবহৃত হয় অট্টালিকা ও বস্তি নির্মাণে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কলকাতার জনবিন্যাস ও বসতি বিবর্তনের সূচনা হয়। কলকাতা শহরে জনবিন্যাস ও বসতি স্থাপনে ঔপনিবেশিক প্রভাবের সঙ্গে স্থানীয় লোকাচার, পেশার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ১৭৫৭-১৯৪৭ এই সময়কালের মধ্যে কলকাতা শহরের জনবিন্যাস ও বসতি বিবর্তনের অনন্য ইতিহাসকে তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সূচক শব্দ- নগরায়ন, জনবিন্যাস, বসতি বিবর্তন, নগর পরিকল্পনা, হোয়াইট টাউন, ব্ল্যাকটাউন, কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা, কলকাতা পৌরসংস্থা, বস্তি।

বর্তমান কলকাতা শহর, যা ছিল একসময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, আজ (২০১১ সালের জনগণনায়) জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষের সপ্তম বৃহত্তম মহানগর। প্রায় ৩৩০ বছর আগে হুগলি নদীর পূর্ব দিকে এই শহরের সূচনার ইতিহাস রয়েছে। ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত অঞ্চলের আয়তন ১৮৫ বর্গ কিলোমিটার যা গড়ে উঠেছে ১৫ টি বোরোর অন্তর্গত ১৪১ টি ওয়ার্ড নিয়ে। কল্লোলিনী কলকাতার বুকে

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ১২২৫০ জন এখনো গৃহহীন[১]। প্রায় ৩ শতক ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা কলকাতার বসতি বিবর্তনের ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। হতশ্রী গ্রাম্য পরিবেশ থেকে জলাজমির মধ্যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে সুদৃশ্য মহানগর হয়ে ওঠার ইতিহাসকে একমাত্র রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের নগরায়নের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অধ্যাপক এস. কে. মুন্সির মতে, নগরায়ন হল নগরে মানুষের ঘনীভবন, যা ঘটে অভিবাসনের ফলে। অভিবাসনের কারণ হলো মানুষের আচরণে বিন্যাসে পরিবর্তন[২]। কলকাতা শহর গড়ে ওঠার পিছনে মানুষের অভিবাসনের কারণগুলি ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুকূল। ইংরেজরা কয়েকটি গ্রামকে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত কলকাতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরীতে 'খাস মহল' হিসেবে[৩]। কলকাতা বা কলিকাতা ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'কালীক্ষেত্র' থেকে এসেছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আবার শ্রী বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন 'কিলকিলা' অথবা 'কলকাটা' বা কাটা খাল থেকে 'ক্যালকাটা' (Calcutta) শহরের নামকরণ হয়। তবে তিনিও শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মত 'কলিচুনের কাতা' থেকে কলিকাতা এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করেছেন[৪]। তবে নামের উৎপত্তি যেভাবেই হোক ১৯১১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, বঙ্গদেশের ষষ্ঠ রাজধানী বিশ্বের দরবারে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা (Calcutta) নামে পরিচিত ছিল।

নগর গড়ে ওঠার ইতিহাস

প্রাথমিকভাবে বসতি বিবর্তনের সঙ্গে নগর পত্তনের ইতিহাস জড়িত থাকে। ড. সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে ভূগোল ও ইতিহাসের গবেষণা পদ্ধতির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে[৫]। সুতরাং বসতি বিবর্তন ও জনবিন্যাসের ইতিহাস জানতে হলে শহর গড়ে ওঠার ইতিহাস প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। ১৬ শতকে পর্তুগিজরা যখন বাংলায় আসতে শুরু করে তখন পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে সাঁতগা (সপ্তগ্রাম) ছিল মুখ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। বঙ্গোপসাগর থেকে আদিগঙ্গা (বর্তমান টালির নালা)পর্যন্ত হুগলি নদীর নাব্যতা জাহাজ চলাচলের জন্য উপযুক্ত ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গার্ডেনরিচে পর্তুগিজরা ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল, হাওড়ার বেতড়ে গড়ে উঠেছিল বাজার[৬]। অন্যদিকে সরস্বতী নদীর তীরে হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম ছিল প্রসিদ্ধ নগর যেখানে তন্তুবায় ও ব্যবসায়ী শেঠ বসাকদের বসবাস ছিল। ভৌগোলিক কারণে ১৬ শতক থেকে সরস্বতী নদীতে চরা পড়তে থাকায় বন্দরের মন্দাবস্থা শুরু হয়। অশনি সংকেত পেয়ে ও বেতড়ের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ করে পাঁচটি শেঠ বসাক পরিবার চলে আসে হুগলি নদীর পূর্বতীরে গোবিন্দপুরে। বর্তমান হেস্টিংস (Hastings) ও ধর্মতলার মধ্যবর্তী স্থানের নামকরণ গোবিন্দপুর হয় তাদেরই ইষ্টদেবতা গোবিন্দজীউ-র নামে। ধর্মতলা থেকে বড়বাজার ছিল কলকাতা, বড়বাজার থেকে বাগবাজার ছিল সুতানুটি গ্রাম। সেখানে তারা সুতি বস্ত্রের হাট গড়ে তোলে[৭]। ১৭ শতকের গোড়ার দিকে প্রত্যেক শনিবার হাট বসত সুতানুটিতে[৮]। সুতানুটির উত্তরে বাফতা সুতোর রুমাল তৈরি হতো, যার ব্যবসা করত ওলন্দাজ বণিকরা। পর্তুগিজদের পরে ওলন্দাজরা হুগলি জেলার পিপলি ও চুঁচুড়ায় বসতি স্থাপন করে। ১৬২৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও হুগলিতে কারখানা করার অনুমতি পায়[৯]। কলকাতা শহরের জমির ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায় ১৮ শতকের প্রথমদিকেও কলকাতার বহু জায়গায় কার্পাস চাষ হতো[১০]। গোবিন্দপুরের তাঁতশাল, কামারহাটির বস্ত্রবয়ন কারখানা ও সুতানুটির হাট ইংরেজদের বাণিজ্যিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এর পাশাপাশি বেতড়ের রমরমা কমে আসায় বিদেশী বাজার সুতানুটিতে স্থানান্তরিত হয়। এই হাটের ক্রেতাদের একটা বড় অংশ ছিল কালীঘাটের তীর্থযাত্রীরা। সুতানুটিতে শেঠ বসাকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের পরিচয় হয়[১১]। এছাড়া কলকাতার জলবায়ু যতই অস্বাস্থ্যকর হোক না কেন ভৌগোলিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিরাপদ ও আকর্ষণীয়। হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থানের কারণে মারাঠা আক্রমণ থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ স্থান যা সমুদ্র

থেকে মাত্র ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত ও নাব্য হওয়ায় গার্ডেনরিচ নোঙর ফেলার উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং হুগলি, হিজলি, উলুবেড়িয়া, সাঁকরাইল এর তুলনায় ইংরেজদের পক্ষে দুর্গ নির্মাণের জন্য কলকাতার থেকে নিরাপদ ও উপযুক্ত স্থান আর কিছুই ছিল না। কলকাতার অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনের উপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ ছিল কলকাতা নগরীর উত্থানের অন্যতম কারণ[১২]। শিল্প নগরী নয়, বাণিজ্য নগরী হিসাব বিকাশ লাভ করে কলকাতা। ইংরেজদের এই বাড়বাড়ন্ত ও দুর্গ নির্মাণ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ বাধে তৎকালীন নবাব শায়েস্তা খাঁর ১৬৮৬ সালে[১৩]। অন্যদিকে মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার্থে অনেক ধনী ও অভিজাত বণিকরা অন্যান্য বিদেশী শক্তির তুলনায় ইংরেজদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসে। ১৮ শতকের গোড়ায় যেখানে কলকাতায় মাত্র ১৫ হাজার মানুষ বসবাস করত, শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ[১৪]। কোম্পানিও মনে করেছিল বাংলার নবাবের হাত থেকে বাণিজ্য রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হল হুগলির মোহনায় সুরক্ষিত বন্দর গড়ে তোলা[১৫]। ১৬৯০ সালে জব চার্নক (Job Charnock) যখন সুতানুটিতে এলেন, সুতানুটিতে কিছু লোকালয় থাকলেও কলকাতা ছিল প্রায় জনমানবশূন্য[১৬]। কলকাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কয়েক ঘর জেলে ও চাষীদের পর্ণকুটির। তখন সুতানুটির উত্তরে চিৎপুর খাল, পশ্চিমে হুগলি নদী, পূর্বে বর্তমান চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (Avenue) ও দক্ষিণে ধর্মতলা। জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, কুমোরটুলি, চিৎপুর, হাটখোলা অঞ্চলে উচ্চবর্ণের মানুষেরা বাস করত। আশেপাশে গ্রামের জেলেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যেত[১৭]। ১৬৯০ সালে জব চার্নক এক ঘোষণা জারি করে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সুতানুটিতে কোম্পানির এলাকায় বসবাস করার আহ্বান জানালেন[১৮]। তবে চার্নকের আগেই আর্মেনিয়ানরা সুতানুটিতে একটি ছোট্ট বাণিজ্য বসতি গড়ে তুলেছিল[১৯]। এইবার চার্নকের ডাকে সাড়া দিয়ে আর্মেনিয়ান, পর্তুগিজ, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতায় আসতে শুরু করে। কলকাতার নগরায়নের পথে জনবসতি স্থাপন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে ইংরেজরা মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের চিকিৎসার পুরস্কার হিসেবে বাংলায় বছরে ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বাণিজ্য করার অনুমতি পায়[২০]।বিভিন্ন আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শক্তির হাত থেকে বাঁচতে ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল একটি দুর্গ। বর্তমান জি.পি.ও. (G.P.O) অঞ্চলে স্যার গোল্ডসবরোর (Goldsborough) পরামর্শে পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ গড়ে ওঠে[২১]। (মানচিত্র ১)

নগরায়ন, জমির ব্যবহার ও জনবিন্যাস

নগরায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের পর থেকেই ইংরেজরা কখনো অবৈধভাবে কর আদায় করে, কখনো ভিত্তিহীন অধিকারকে বৈধ করার চেষ্টায় গ্রাম কিনে নেয়। ফলে কোম্পানির মালিকানা ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত হতে থাকে। ১৬৯৮ সালে বাংলার সুবেদার মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নাতি, আজিম-উস-শানের অনুমতি আদায় করে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার জমিদারী কিনে তা অধিগ্রহণ করে[২২]। জমিদারী লাভের ফলে কোম্পানির কয়েকটি অধিকার জন্মায়। যেমন রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের বৈধ অধিকার, পতিত জমি বিলি করার অধিকার ও জরিমানা এবং নতুন শুল্ক আদায়ের অধিকার[২৩]। এর ফলে কোম্পানি আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নগরায়নের জন্য এই অর্থের কিছুটা ব্যয় করা হয়। ১৭০৭ সালে কোম্পানি কলকাতাকে একটি পৃথক প্রেসিডেন্সি (Presidency) ঘোষণা করায় শাসনভার চলে যায় কোম্পানির লন্ডন শাখার অধিকর্তার অধীনে। ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে নতুন নবাব মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তি আবদ্ধ হয় কোম্পানি। চুক্তি অনুযায়ী ২,২২,৯৫৮ টাকার বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে মারাঠা ডিচের (Marhatta Ditch)

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

অন্তর্ভুক্ত জমি ও তার বাইরে ৬০০ গজ পর্যন্ত জমি কোম্পানির অধীনে আসে[২৪]। মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ১৭৪২ সালে ইংরেজরা এই পরিখা খনন করে নিজেদের এলাকা ঘিরে ফেলার জন্য। পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলির (Lord Wellesley) আদেশে (১৮০২) কলকাতার যাবতীয় জঞ্জাল ও মাটি ফেলে ওই খাল ভরাট করা হয় যা উত্তরে এন্টালী বাজার থেকে শুরু করে সার্কুলার রোড ধরে হালসিবাগান, গোবিন্দ মিত্র, উমি চাঁদের বাগানবাড়ি নিয়ে নতুন ব্যারাকপুর সেতু ও পরিখার দক্ষিণ পাড় ধরে বাগবাজারের কাছে হুগলি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল[২৫]। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে কোম্পানির যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গেই যেন সূচনা হয় আধুনিক কলকাতা শহরের। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বসতি বিবর্তনের ইতিহাস শুরু হয়। যদিও আক্ষরিক অর্থে কলকাতার নগরায়নের সূচনা হয়েছিল ১৯ শতকের গোড়ায় লর্ড ওয়েলেসলির হাত ধরে। ১৭৭২ সালে কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয়। ১৭৯৩ সালে নবাবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পাকাপাকি ভাবে কোম্পানির দখলে আসে। রিচার্ড ওয়েলেসলিকেই (Richard Wellesley, ১৭৯৭-১৮০৫) কলকাতার রূপকার বললে অত্যুক্তি হবেনা[২৬]। ১৮ শতকের শুরুতে চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণে ছিল বিশাল জঙ্গল, চাঁদপাল থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত খাঁড়ি বিস্তৃত ছিল। চৌরঙ্গী ছিল জঙ্গলে ঢাকা, বন্য পশু ও ডাকাতের দেখা পেত কালীঘাটে তীর্থযাত্রীরা। খিদিরপুর আর পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মাঝে 'শেঠ'রা বাস করত। ১৭৫৭ সালের চুক্তির পর এই চিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে। ১৭৫৮ সালে ইংরেজরা মীরজাফরের থেকে ৫৫ টি গ্রাম কিনে নেয়। 'ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের' অন্তর্গত গ্রামগুলি হল –

১) ডিহি সিঁথি – সিঁথি, কাশীপুর, পাইকপাড়া
২) ডিহি চিৎপুর – চিৎপুর, টালা, বীরপাড়া, কালিদহ
৩) ডিহি বাগজোলা – দক্ষিণদাড়ি, কাকুড়িয়া, নোয়াবাদ
৪) ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়া – বেলগাছিয়া
৫) ডিহি উল্টোডাঙা – উল্টোডাঙা, বাগমারী, গৌরীবাড়ি
৬) ডিহি সিমলা – বাহির সিমলা, নারকেলডাঙা
৭) ডিহি সুরা – সুরা, কাঁকুড়গাছি, কুচনান, দত্তাবাদ
৮) ডিহি কুলিয়া – মল্লিকাবাদ, কুলিয়া
৯) ডিহি শিয়ালদহ – শিয়ালদহ, বেলেঘাটা
১০) ডিহি এন্টালী – এন্টালী, পাগলাডাঙা, নিমুকপোতা, গোবরা, ট্যাংরা
১১) ডিহি তোপসিয়া – তোপসিয়া, তিলজলা, বেনিয়াপুকুর, কড়েয়া
১২)ডিহি শ্রীরামপুর – চৌবাঘা, ধুল্লুন্দা, সাঁপগাছি, অন্তবাদ, নোনাডাঙা, বন্ডেল-উলুবেড়িয়া, বেদিয়াডাঙা, কুষ্টিয়া, পুরান্নুজ্জুর, ঘুঘুডাঙা, শ্রীরামপুর
১৩) ডিহি চকের বেড় – বালিগঞ্জ, গুদসাহা, চকেরবেড়
১৪) ডিহি ভবানীপুর – ভবানীপুর, নিজগ্রাম
১৫) ডিহি মনোহরপুর – বেলতলা, কালীঘাট, মনোহরপুর, মুদিয়ালি, সাহানগর, কয়কালি[২৭]।

১৭৬৫ সালে চব্বিশ পরগনার জমিদারী পাওয়ার পর মারাঠা খালের বাইরে পঞ্চান্নগ্রামের নিষ্কর জমি কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়। কলকাতা ছিল বনজঙ্গলে ঢাকা ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চল। বানিজ্যকেন্দ্র হওয়ায় সুতানুটি ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। তাই ইংরেজরা সেখানেই পাকাপাকিভাবে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে গোবিন্দপুরের বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হয় নতুন দুর্গ স্থাপনের জন্য। দুর্গ নির্মাণের জন্য কুলিরা বাস করত বর্তমান হেস্টিংস অঞ্চলে যার নাম ছিল কুলিবাজার। সামরিক প্রয়োজনে সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ময়দান সৃষ্টি হল। পুরোনো দুর্গ

ভেঙে বর্তমান বিবাদীবাগে পাওয়া গেল বিশাল ভূমিখন্ড। কোম্পানি এখানেই গড়ে তুলল সরকারি, প্রশাসনিক ভবনগুলো। তৈরি হল কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র সেন্ট্রাল বিজনেস ডিসট্রিক্ট (Central Business District) যার চরিত্র আজও প্রায় একই রকম আছে। নগরায়ন মুছতে শুরু করল কলকাতার গ্রাম্য চেহারা, বাড়তে শুরু করল পাকা বাড়ির সংখ্যা। পাশাপাশি দেখা দিল ঔপনিবেশিক বৈষম্য। ১৮ শতকে এক ফরাসি আধিকারিক এল. ডে. গ্র্যান্ডপ্রে (L. De. Grandpre) কলকাতা পরিদর্শনে এসে কলকাতার উত্তর-দক্ষিণে বিভাজন রেখা টেনে 'হোয়াইট টাউন' (White Town), ব্ল্যাক টাউন (Black Town) নামকরণ করেন[২৮]। ১৭৮৪ সাল নাগাদ কলকাতাকে সুপরিকল্পিতভাবে 'সাদা' ও 'কালো' শহরে বিভাজন করার পদক্ষেপ হয়[২৯]। ১৮ শতক থেকেই কোম্পানি কলকাতাকে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গড়ে তুলতে থাকে। কলকাতার স্থানিক বিকাশ ও জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে বড়বাজারের উত্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়বাজারকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিকশিত হতে থাকে। অপরিকল্পিতভাবে শুধুমাত্র জাতি ও পেশার ভিত্তিতে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে, যেমন – মুচিপাড়া, মেছুয়াবাজার, আর্মানিতলা ইত্যাদি। ওদিকে কোম্পানিও রায়তদারদের মধ্যে জমি বন্টন করে পেশার ভিত্তিতে, যেমন – কুমোরটুলি, কলুটোলা ইত্যাদি।প্রথমে বড়বাজার আসেন শেঠ, বসাকদের পূর্বপুরুষরা। তারপর কুন্ডু, মল্লিক, ঠাকুর, ঘোষ ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা। ১৭৩৬ সালে বড়বাজারে নাম ছিল কমল নয়নের বেড়[৩০]।

নগরায়নের নিশ্চিত ফলাফল হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি,যা নির্ভর করে স্বাভাবিক অগ্রগতি ও অভিবাসনের ওপর। ১৮ শতকে কলকাতায় অভিবাসনকারীদের মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ায় জন্মহার কম ছিল। ফলে নগরায়নের গতিও ছিল মন্থর[৩১]। নগরায়নের পথে প্রাথমিক বাধা ছিল অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, বসন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, কোম্পানির মুদ্রা সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি। আরেকটি প্রধান সমস্যা ছিল মূলধনের অভাব। কলকাতার দেশীয় ধনীরা কলকাতা শহরের তুলনায় নিজস্ব গ্রামেই বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী ছিলেন। অন্যদিকে কোম্পানি রাজস্ব আদায় করলেও নগরায়নের উপযোগী ভূমি বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। এছাড়া বিচার বিভাগ ব্যবস্থা কর্তৃক সম্পত্তির অধিকার রক্ষার্থে ক্ষতিপূরণ নীতি নগরায়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

১৭৯৪ সালে নগর পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে জাস্টিস অব পিস (Justice of Peace) স্থাপিত হয়। তবে আক্ষরিক অর্থে কলকাতার নগরায়নের সূচনা হয়েছিল ১৯ শতকের গোড়ায়। ওয়েলেসলির (Wellesley) মিনিট-কে (Minute) কলকাতার নগর পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট (blueprint) বলা যায়, যা ১৮০৩ সালের ১৬ই জুন নথিভুক্ত হয়[৩২]। ওয়েলেসলি উপলব্ধি করেছিলেন স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, ও সুবিধার জন্য স্থায়ী বাসস্থান প্রণয়ন প্রয়োজন। সেই সময় শহর 'সাদা' ও 'কালো' অংশে বিভক্ত। নগর পরিকল্পনায় সাহেবপাড়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও নেটিভ (Native) অধ্যুষিত উত্তর কলকাতার প্রতি অবহেলা সুস্পষ্ট। ১৮০৪ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত লটারি কমিটি ইউরোপীয় ধাঁচে কলকাতার নগর পরিকল্পনা করে[৩৩]। ১৯ শতকের প্রথমেই জলাভূমির সংস্কার করে, বন কেটে বসতির জন্য জমি উদ্ধার শুরু হয়। উধাও হতে থাকে পর্ণকুটির। কলকাতার সৌন্দর্যায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয় শহরের রাস্তাঘাট, জল নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালী, বাড়ি নির্মাণ, বাজার, কসাইখানা, কারখানা গড়ে তোলার ওপর[৩৪]। সেখানেও উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার ফারাক চোখে পড়ার মতো। তবে উত্তর কলকাতার অপরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্যহীনতার জন্য কোম্পানিকে এককভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। দেশীয় ধনী জমিদার ও বেনিয়ানরা নিজেদের প্রাসাদতুল্য ভবনে বাস করলেও প্রাসাদ সংলগ্ন রাস্তাঘাট বা জল নিকাশের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। কলকাতার নগরায়নে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী কোম্পানির সবচেয়ে বড়ো অবদান। ১৯ শতকে সরকারি উদ্যোগে কলকাতায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। যদিও প্রতি ক্ষেত্রেই নেটিভদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। ১৮২০ সাল নাগাদ ইংরেজরা বড়ো মাত্রায় ভূমি অধিগ্রহণ শুরু করে দেয় নগরায়নের উদ্দেশ্য। এমনকি ইউরোপীয়দের থেকেও জমি

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

অধিগৃহীত হয়[৩৫]। পাশাপাশি শুরু হয় পুকুর ভরাট করার কাজ। ১৮৮১ সালে গঠিত হয় ট্যাংক কমিটি (Tank Committee)[৩৬]। ১৮১৭ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে লটারি কমিটি একের পর এক গড়ে তোলে কলকাতার প্রধান রাস্তাগুলি। গড়ে ওঠে উদ্যান, সেতু, ফুটপাত, রাস্তার বাতি, ঘোড়ায় টানা ট্রাম, লালদিঘি খনন, পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি (Calcutta Tram Company, ১৮৮০), ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (Calcutta Electric Supply Company, ১৮৯৭)[৩৭]। ১৮৩৬ সালে লটারি কমিটির কার্যকালাপের অবসান ঘটে। ১৮৩৮ সালে ফিডার হসপিটাল কমিটি (Fedeer Hospital Committee) এর স্থান দখল করে[৩৮] । বদলে যেতে থাকে কলকাতার গ্রাম্য চেহারা। একাধিক হাসপাতাল, উদ্যান, সরকারি ভবন ও কার্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৮০ সাল নাগাদ কলকাতা সেজে ওঠে ভিক্টোরিয়া সাজে। ১৮৭৬ সালে ১৮ টি ওয়ার্ড (Ward) নিয়ে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (Calcutta Municipal Corporation) গঠন হলে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে[৩৯]। এগুলি হল শ্যামপুকুর, কুমোরটুলি, বড়তলা, সুকিয়া স্ট্রিট, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, কলুটোলা, মুচিপাড়া, বউবাজার, পদ্মপুকুর, ওয়াটারলু স্ট্রিট, ফেনুইক বাজার, তালতলা, কলিঙ্গ, পার্কস্ট্রিট, বামন বস্তি ও হেস্টিংস (বন্দর ও দুর্গ সহ)। এই অঞ্চলের বাইরে ছিল কলকাতার শহরতলি। ১৮৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কলকাতার শহরতলি ছিল কাশীপুর, চিৎপুর, উল্টোডাঙা, মানিকতলা, বেলেঘাটা, এন্টালী, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, আলিপুর, একবালপুর ও গার্ডেনরিচ।ক্রমশ প্রায় সমগ্র শহরতলি কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় সংযুক্ত এলাকা হিসাবে (Added Area)[৪০]। নতুন সংযুক্ত এলাকাগুলি গড়ে ওঠে সাহেব এলাকার দক্ষিণে। সাহেবরা ক্রমশ দক্ষিণে এই নতুন গড়ে ওঠা সংযুক্ত অংশে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে সুলভ মূল্যে বড় জমি দখলের উদ্দেশ্যে। শুরু হয় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ। শাসিতের থেকে নিজেদের আলাদা করতে শাসক নিজের এলাকাকে স্বতন্ত্র করে ঘিরে ফেলে। যদিও ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতিভিত্তিক এলাকাগুলি নগরায়নের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। তবুও বাঙালি এলাকাগুলির জটিল কাঠামোর মধ্যে জাতিগত ভাবনার অস্তিত্ব ছিল অনেকটা সময় ধরে। স্থানীয় রীতিনীতি, লোকাচার, পেশা ইত্যাদি শহরের স্থানিক বিকাশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শহরের মধ্যস্বত্বভোগী ভারতীয় দালাল, বেনিয়ানরা পরবর্তীকালে অভিজাত হয়ে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে জাঁকিয়ে বসে কলকাতার 'বাবু' সংস্কৃতি গড়ে তোলে। ১৯ শতকের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ও শিল্পায়নের ফলে অনিবার্যভাবে শহরমুখী অভিবাসন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে পাটকল, তেলকল, চালকলে কাজ করতে উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, এমনকি বিদেশ থেকেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয়[৪১]। আর্মেনিয়ানরা ছিল ফেরিওয়ালা ও ব্যবসায়ী, চৈনিকরা ছিল দক্ষ জুতো কারিগর। ১৭৯৮ সাল থেকে ইহুদিরা মুরগিহাটা (ক্যানিং স্ট্রিট /Canning Street) অঞ্চলে বাস করতে শুরু করে। তারা ছিল পেশায় রত্ন ব্যবসায়ী। বড়বাজার ও কলুটোলায় জড়ো হয়ে ১৮৯১ সালের পর থেকে ক্রমশ দক্ষিণ কলকাতায় সরে যায় তারা।১৯ শতকের মধ্যভাগে কলকাতা হয়ে ওঠে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির স্নায়ুকেন্দ্র। ফলে গ্রাম থেকে শহরে প্রচুর মানুষ অভিবাসন করে। তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৭%[৪২]। জনসংখ্যার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় জমির চাহিদা, বাসস্থানের চাহিদা, স্বাভাবিকভাবে জমির দাম ও বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি জনসংখ্যার চাপ বাড়ে শহরতলিতে। শহরের সীমানা প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাশীপুর, বেলেঘাটা, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ, আলিপুরে এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চিৎপুর, উল্টোডাঙা, ভবানীপুর, একবালপুর, গার্ডেনরিচে জনসংখ্যা হ্রাস পায়[৪৩]।

বিশ শতকের গোড়ায় কলকাতার নগরায়নের হাল ধরে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (Calcutta Improvement Trust/CIT)। মূলত কলকাতা শহরের প্রান্তীয় অঞ্চলে বসতি উন্নয়ন ও নতুন বসতি গড়ে

তোলার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে ১৯১১ সালে। ক্রমে কলকাতার বাণিজ্যিক উন্নয়ন, ট্রাম পরিষেবার প্রসার ও শহরের সৌন্দর্যায়নেও CIT অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত ৭-১৮ নম্বর ওয়ার্ড গুলিতে (Wards) বস্তি উচ্ছেদ করে পাকা বাড়ি, অফিস ঘর নির্মিত হয়। চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রিট, লিন্ডসে স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, ফ্রী স্কুল স্ট্রিট, কর্পোরেশন স্ট্রিট ইত্যাদি অঞ্চল বছর দশেকের মধ্যেই বসতি অঞ্চল থেকে অফিস পাড়ায় পরিণত হয়। এই অঞ্চল থেকে উৎখাত হওয়া গরিব মানুষগুলো শহরের উত্তর ও দক্ষিণে আশ্রয় নেয়। উত্তরে ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ড ও দক্ষিণে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ এলাকায় জনসংখ্যা প্রায় ৪৭% বৃদ্ধি পায়। মানিকতলা, কাশীপুর, চিৎপুর, গার্ডেনরিচ এলাকায় কারখানার শ্রমজীবী মানুষের ভিড় বাড়ে। এর ফলে মূল শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এইসব অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে বসতি গড়ে ওঠে[৪৪]। এই অঞ্চলগুলি মূল শহরের শ্রমিকসহ অন্যান্য নাগরিক চাহিদা পূরণ করে একান্ত প্রয়োজনীয় অংশে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও পৌর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়। অনুন্নত নাগরিক পরিকাঠামো, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, নিকাশি ব্যবস্থার অভাব, অসুখের উপদ্রবের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৪৭ এর দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যা। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট (Calcutta Municipality Act) পরিমার্জন করে বেড়ে চলে শহরের কায়া।

সারণি-১ কলকাতার ক্রমবর্ধমান আয়তন

বছর	ভৌগোলিক অঞ্চল (একর)
১৭০১	১৬৮২
১৮০১	৪৯৯৭
১৯০১	১১৯৫৪
১৯৫১	১৮১৩৬

* তথ্যসূত্র- *ভারতীয় জনগণনা প্রতিবেদন ১৯৫১*, ৬ নম্বর সংখ্যা , তৃতীয় ভাগ, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১-১৮

একটি শহরের কাঠামোর চরিত্র নির্ভর করে সেখানকার মানুষ কীভাবে একটি বিশেষ অর্থনীতির মধ্যে জমি বা স্থান ব্যবহার করবে তার ওপর। এই কাঠামো নির্ভর করে ভৌগোলিক পরিবেশ, মানুষের চিরাচরিত সামাজিক আচরণ ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর। কলকাতা শহর প্রথম থেকেই পশ্চিমে হুগলি নদী ও পূর্বে জলাভূমির অবস্থানের জন্য চতুর্দিকে সমানভাবে প্রসারিত হতে পারেনি। বরং উত্তর দক্ষিণে রৈখিক বসতির আকার ধারণ করে। ১৮ শতকের সূচনায় কলকাতা গঠিত ছিল ইউরোপীয় কলকাতা (পুরোনো ডিহি কলকাতার অংশ), গ্রামীণ বসতি ও ধর্মীয় স্থান (গোবিন্দপুর), সনাতন ভারতীয় বাজার (বড় বাজার), ও নদী তীরবর্তী সুতি বস্ত্রের হাট (সুতানুটি) নিয়ে। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল জলজঙ্গলে ঘেরা কৃষজীবী, মৎসজীবী গ্রাম, ধর্মীয়স্থান ও ছোটোখাটো ব্যাবসাকেন্দ্র[৪৫]।

সারণি – ২ কলকাতার জমির ব্যবহার (১৭০৭)

	সুতানুটি(একর)	**কলকাতা (একর)**	**বাজার কলকাতা (একর)**	**গোবিন্দপুর (একর)**	**মোট অঞ্চল (একর)**

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

বাসস্থান	৪৪.৭	৮২.৮	১৩৩.৯	১৯.২	২৮০.৬
রাস্তাঘাট	২৪.১	-	-	-	২৪.১
কৃষিজমি	২৮০.৪	৩৩৫.৭	২০.২	২৬৮.৮	৯০৫.১
বাগান	৪৯.১	২৩.৪	৬.৭	১৯.৭	৯৮.৯
খাল	৩.৫	০.২	১.৭	০.৪	৫.৮
জঙ্গল	১৬২.৪	১২১.৩	-	২৭.৯	৩১১.৬
পতিত	-	৯.১	০.৩	৫৬.৫	৬৫.৯
মোট	৫৬৪.২	৫৭২.৫	১৬২.৮	৩৯২.৫	১৬১২

***তথ্যসূত্র** : মণিদীপ চ্যাটার্জী 'ক্যালকাটা দি প্ল্যানিং অ্যাগোনিস', *মিলিয়ন সিটিস অব ইন্ডিয়া*, স. আর. পি. মিশ্র, কমলেশ মিশ্র, নিউ দিল্লি, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা – ১৫২

১৭০৭ সালের কোম্পানির সমীক্ষা থেকে (সারণি – ২) জানা যায় বাজার কলকাতা ছিল অত্যন্ত ঘনজনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। মোট জমির প্রায় ৮২.৮ শতাংশ আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। ৪টি এলাকার মোট জমির প্রায় ১৬.৬ শতাংশ বাসস্থানের জন্য ব্যবহৃত হত। ১৮ শতকের মধ্যভাগে দুর্গকে কেন্দ্র করে হুগলি নদীর তীরে প্রায় ২৫০ একর জমি নিয়ে যে জনবসতি গড়ে উঠল সেখানে বাণিজ্যিক, সেনা, প্রশাসনিক ও আবাসিকদের বাস করতে দেখা যায়। হ্যামিলটন (Hamilton) এর মতে শহরটি ঘনবসতিসম্পন্ন হলেও বাড়িগুলিতে প্রশস্ত বাগান লক্ষ্য করা যেত। স্ক্র্যাফটনের পরিকল্পনায় (Scrafton's Plan) কিছু বিক্ষিপ্ত পাকাবাড়ি চোখে পড়ে দেশীয় অঞ্চলে যা মারাঠা খাল দ্বারা পরিবৃত[৪৬]। ততদিনে কলকাতা 'সাদা' ও 'কালো' অংশে বিভক্ত। সাহেব কলকাতায় ধনী শেঠ ও বসাকদের ঘরবাড়ি ছিল, সেখানে ইউরোপীয়রা ভাড়ায় থাকত। সাদা, কালো এই মেলামেশা বন্ধ করতে বিলেত থেকে আসা নির্দেশানুসারে প্রথমে সাহেব অঞ্চল থেকে কালো মানুষদের বহিষ্কার ও পরে ইংরেজদের ঘর বাড়ি দেশীয়দের কাছে বিক্রি বন্ধ হল। ইতিমধ্যে প্রায় ২২০ একর জমির 'সাদা শহর' মারাঠা আক্রমনের ভয়ে খুটি পুঁতে ঘিরে ফেলা হয়। এই অঞ্চলে ছিল এখকার ফ্যান্সি লেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, পর্তুগিজ চার্চ, লেন, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট ইত্যাদি[৪৭]। ওরমের মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চল বিস্তৃত ছিল পূর্বদিকে ৬০০ গজ এবং দুর্গের উত্তর দক্ষিণে আধ মাইল। ১৭০০ সালে এই অঞ্চলের ১৭০০ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ২৫০ বিঘা জমি রূপান্তরিত হয়েছিল বাস্তু জমিতে, বাকিটা ছিল ধান জমি[৪৮], সবজি, তামাক ক্ষেত, কলাবাগান, বাঁশ বাগান, জঙ্গল, পতিত জমি ও ফুলবাগান[৪৯]। ১৮ শতকের গোড়ায় কলকাতার মোট এলাকা ছিল ৫০৭৭ বিঘা যার মধ্যে প্রায় ৮৫০ বিঘা জমিতে বসতি গড়ে উঠেছিল[৫০]। ইউরোপীয় কলকাতার পরেই শুরু হয়েছিল দেশীয়দের বাজার[৫১]। বাজার কলকাতায় জঙ্গলের কোন নিদর্শন না থাকলেও প্রায় ৪.১% জমিতে বাগান দেখা যেত। এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের জন্য বরাদ্দ কিছু করমুক্ত সম্পত্তি ছিল[৫২]। ২ নম্বর মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে দেশীয় অধ্যুষিত বিচ্ছিন্ন ব্ল্যাক টাউন (Black Town) উত্তরে বাগবাজার থেকে দক্ষিণে বউবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি ছিল অত্যন্ত ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। ১৮২২ সালের জন বুলের (John Bull) তথ্য থেকে জানা যায় মেছুয়া বাজারের উত্তরে বসতি বিশেষ ছিল না। শহরের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে বিস্তীর্ণ বাগান, আধ শুকনা পুকুর সহ বড়ো বড়ো ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি দেখা যেত[৫৩]। অন্যদিকে চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড সংলগ্ন ইউরোপীয়

শহরে ছিল স্বল্প সংখ্যক মানুষের বাস। ইউরোপীয়রা দেশীয় ঝুপড়ি নিয়ে ভীত হলেও গৃহ সহায়ক ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার স্বার্থে দূরত্ব বজায় রাখতে পারেনি। কাশীতলার ঘিঞ্জি চিনা বাজার থেকে খুচরো ও পাইকারি দ্রব্য সরবরাহ হত সাহেব পাড়ায়[৫৪]। মধ্যবর্তী মিশ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল উত্তরে কলুটোলা স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল বউবাজার স্ট্রিট, ধর্মতলা স্ট্রিট, জানবাজার স্ট্রিট ইত্যাদি ।এই মিশ্র অঞ্চলে দেশীয় ও ইউরোপীয় দুই ধরনের মানুষ বাস করার ফলে এটি ছিল শহরের সব থেকে ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর অংশ। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজ, গ্রিক, ও আর্মেনীয়রা এখানে বসতি গড়ে তোলায় এই এলাকা আচারগত অপবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হত। এরা পেশায় ছিল কোম্পানির কর্মচারী বা স্বাধীন ব্যবসায়ী। এছাড়াও ছিল ইহুদি, আরবি, ফারসি ও গুজরাটি ব্যবসায়ীরা[৫৫]। ১৮৪৭ সালে কলকাতাকে চারটি প্রশাসনিক ভাগে ভাগ করা হয় যেখানে উত্তর কলকাতাকে দুটি ভাগে ও দক্ষিণ কলকাতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়[৫৬] ।বোর্ড অফ সেভেন কমিশনারস (Board of Seven Commissioners) গঠনের মাধ্যমে সূচনা হয় আধুনিক পৌর প্রশাসনের। ১৮৫০ সালের সিমের সমীক্ষা (Simm's Survey) অনুযায়ী কলকাতাকে পুনরায় উত্তর ও দক্ষিণ দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ১৮৫৬ সালে[৫৭]।

দক্ষিণ কলকাতার দক্ষিণ অংশ পরিচিত হয় ইউরোপীয় এলাকা হিসেবে। সেসময় ভবানীপুর ছিল শহরতলি এলাকা। মুসলমান শ্রমজীবীদের বসতি ছিল শহরের কেন্দ্রে ও দক্ষিণে। ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে শুরু করে ইউরোপীয় এলাকার অভ্যন্তরেও মুসলমান বসতির ঘনত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানে খানসামা, ওস্তাগার, উকিল, মুন্সি, প্রভৃতি পেশার মানুষ বাস করত। এছাড়া শহরতলি এমনকি উত্তর কলকাতার বেনিয়ান অঞ্চলেও মুসলমান বসতি ছিল। ১৯ শতকের মাঝামাঝি মিশ্র অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ আর দেশীয় এলাকার প্রান্তীয় অঞ্চলে মুসলমান বসতির প্রাধান্য দেখা গেল[৫৮]। চিৎপুরের নবাব ও মহীশূর থেকে আগত টিপু সুলতানের বংশধরদের শহরের দুই বিপরীত প্রান্তে বসতি স্থাপন করতে দেখা গেল[৫৯] ।উত্তর কলকাতায় মূলত বাঙালি হিন্দু বেনিয়ান পরিবারগুলি ও একটি উত্তর ভারতীয় পরিবার বসতি স্থাপন করল[৬০]। উত্তর কলকাতায় পাকা বাড়ির সংখ্যা কম ছিল। সেসময় সার্কুলার রোডের (Circular Road) ওপর দেশীয়দের স্থাবর সম্পত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তৎকালীন কলকাতার 'বাবু' সমাজ বিত্তবান ইউরোপীয়দের মতো বাগানবাড়ি গড়ে তুলেছিল। বর্ণাঢ্য বেনিয়ান ও দেওয়ানরা প্রাসাদতুল্য ভবন নির্মাণ করেছিল[৬১] । ১৯ শতকের গোড়ায় পেশার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল চড়কডাঙা, রথতলা, গোঁসাই পাড়া, কাঁসারিপাড়া, দর্জি পাড়া[৬২]। অন্যদিকে সিমলা, শ্যামবাজার, বাগবাজার, জোড়াবাগান, পাথুরিয়াঘাটায় গড়ে উঠেছিল বেনিয়ানদের অভিজাত পাড়া। পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বাঙালির ছোটো বা মাঝারি আয়তনের পাকা বাড়ি গড়ে উঠতে দেখা যায় এই সমস্ত এলাকায়। পেশায় এরা ছিল কেরানি, অধস্তন কর্মচারী, পেশকার, ডাক্তার, ছোটো জমিদার ইত্যাদি। তার পাশেই ছিল গরিব মানুষের বস্তি। আর্থিক বৈষম্য যেন বসতির ক্রমবিন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়[৬৩]। দেশীয় এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে ছিল বাস্তুচ্যুত। অন্যদিকে হোয়াইট টাউনে (White Town) গড়ে ওঠে প্রশস্ত জমির উপর বাংলো ধরনের ঘরবাড়ি যার গঠনশৈলী ছিল ভারতীয়দের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শাসক ও শাসিতের এই বিভেদ শুধু ঘরবাড়ির গঠনশৈলীতে নয় দুটো এলাকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, পরিষেবা ও নিরাপত্তাদানের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই বিভাজন তত্ত্ব ব্ল্যাক টাউনের (Black Town) বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এই বিভাজন সত্ত্বেও দুই এলাকার উচ্চতর সামাজিক স্তরের মানুষের মধ্যে মেলামেশা অব্যাহত ছিল[৬৪]। ১৯ শতকের শেষভাগে হ্যারিসন রোড (Harrison Road) নির্মিত হওয়ার পর রাজপথের দুই পাশে নির্মিত হয় মাড়ওয়ারিদের বহুতল বাড়ি[৬৫]।

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

আবাসিক উদ্দেশ্য ছাড়াও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জমির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকে। লালদিঘির উত্তরে ছিল দেশীয়দের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র 'বড়বাজার'। বাজার কলকাতা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল মধ্যস্বত্বভোগী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের দৌলতে। অপরিকল্পিত নির্মাণ ও জমি কেনা বেচার জন্য স্থাবর সম্পত্তির বাজারে জোয়ার আসে[৬৬]। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড যেমন- দোকান হাট, গোডাউন, গুদামঘর, ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) অফিস ইত্যাদি গড়ে উঠলো ধর্মতলা স্ট্রিট, জোড়াবাগান, বড়বাজার, হাটখোলা অঞ্চলে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি মশলা ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয় ধর্মতলা, বেনিয়াতলা, আহিরিটোলা, শোভাবাজার অঞ্চলে। বাঙালিরা দানাশস্য, তিসি, চটের থলি ইত্যাদি ব্যবসায় নিযুক্ত হল[৬৭]। বউবাজার স্ট্রিটে ঘড়ি সারাই, চিরুনি ও ব্রাশ (brush) নির্মাতাদের দোকান ছিল। ১৮ শতক থেকেই বস্ত্র ও সোনা ব্যবসায়ী শেঠ, বসাকরা বড়বাজারকে কেন্দ্র করে পাইকারি বাজার গড়ে তুলেছিল। বেনারস থেকে আগত মনোহর দাশ আগরওয়াল ও ওসওয়াল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চলের মহাজন[৬৮]। এই অঞ্চলে সংকীর্ণ রাস্তা, ঘিঞ্জি বসতির মধ্যে যত্রতত্র গড়ে উঠেছিল অট্টালিকা, যার সঙ্গে নগর পরিকল্পনা ও সৌন্দর্যায়নের কোন সম্পর্ক ছিল না। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই বাড়িগুলি বাণিজ্যিক ও আবাসিক দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। বাণিজ্য প্রসারের ফলে ক্রমশ মধ্য কলকাতা থেকে আবাসিকরা সরে যেতে শুরু করল। বড়বাজার এর বিস্তার ছিল হুগলির পাড় ধরে জোড়াবাগান ও কুমোরটুলির মধ্যে, যা বর্তমান বড়বাজারের তুলনায় অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে ছিল সুতোপট্টি, পগেয়াপট্টি, কটন স্ট্রিট, ক্লাইভ স্ট্রিট, মনোহর দাশ কাটরা, পরাখ কোঠি, সদামুখ কোটলা, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, খ্যাংরা পট্টি, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস (Royal Exchange Place), চিনাবাজার, রাধাবাজার, চিৎপুর রোডের কিছু অংশ। ১৭৫৬ সালে সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় নবাবের সেনা বড়বাজারে আগুন লাগিয়ে দখল করে নিয়েছিল। এই দেশীয় বণিক অধ্যুষিত এলাকা[৬৯]। বউবাজর ও বর্তমান বিবাদীবাগের উত্তর থেকে পূর্ব পশ্চিমে ছড়িয়ে ছিল নেটিভ টাউন (Native Town), যেখানে তাঁতি ও বণিকদের উদ্যোগে প্রথম বাজার গড়ে ওঠে। ১৯ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই বাংলার বাইরে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ব্যবসায়ী ও মহাজনরা বড়বাজারের টানে আসতে থাকে। যোধপুর ও মাড়ওয়ার থেকে আগত ব্যবসায়ীরা যে শুধু ইউরোপীয়দের সমান্তরাল ব্যবসা করত তাই নয়, বড়বাজার ক্রমে আন্তর্জাতিক চরিত্র গ্রহণ করে। বাঙালি ছাড়াও ছিল আর্মেনিয়ান, পার্সি, ইহুদি, চৈনিক, মগ, বর্মী, জৈন, আরব, গুজরাটি ও মারাঠি ব্যবসায়ীরা। রপ্তানি সামগ্রী যেত সুদূর ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়। মাড়ওয়ারি সমাজ ছিল খুবই ঐক্যবদ্ধ, তারা দ্রুত বড়বাজারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে[৭০]।এছাড়া সামান্য কিছু শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল কাশীপুর, গার্ডেনরিচ এলাকায়। এখানে মূলত কল-কারখানা, বন্দর, বহুবিধ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠতে দেখা যায়। গার্ডেনরিচ অঞ্চলে বিশেষ বসতি না থাকলেও কাশীপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ।

সারণি-৩. কলকাতার জমি ব্যবহারের পরিবর্তন (১৮৪৭-১৯১১)

জমির ব্যবহার	শতকরা হার	
	১৮৪৭	১৯১১
আবাসিক	৬৩.৯২	৪১.৭২
বাণিজ্যিক	০.৬৭	৯.৫১
শিল্প	-	০.৮২

গণ ও আধা-গণপূর্ত বিভাগ	১.৪২	৪.৪২
পরিবহন ও যোগাযোগ	১১.৯৫	-
বিনোদন	০.২৩	১.৩৯
বস্তি	-	১৫.২০
কৃষি	-	-
জলাশয়	১.৬৫	-
জলাভূমি, পতিত জমি ও জঙ্গল	২০.১৬	-
অন্যান্য	-	২৬.৮৪

***তথ্যসূত্র** : মণিদীপ চ্যাটার্জী 'ক্যালকাটা দি প্ল্যানিং অ্যাগোনিস', *মিলিয়ন সিটিস অব ইন্ডিয়া*, স. আর. পি. মিশ্র, কমলেশ মিশ্র, নিউ দিল্লি, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা – ১৫৩

সারণি-৩ লক্ষ্য করলে ১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের সূচনায় কলকাতার জমি ব্যবহারের পরিবর্তন দেখা যায়। যদিও আবাসিক জমির শতকরা হার ১৯১১ সালে কিছু কমে যায় (৪১.৭২%), কিন্তু বাণিজ্যিক ও শিল্পের পাশাপাশি বস্তির উদ্দেশ্যে জমির ব্যবহার বৃদ্ধি (১৫.২০%) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোঝাই যায় যে ১৯ শতকের শেষের দিকে বস্তিবাসী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে চটকলের কুলিমজুরদের জন্য। অন্যদিকে জলাভূমি, পতিত জমি জঙ্গল এবং জলাশয়ের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯ শতকের শেষভাগে জনসংখ্যা ও পাকা বাড়ির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৮৫০ সালের হিসেবে দেখা যায় কুঁড়ে ঘরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি-৪)। কাশীপুর, বেলেঘাটা, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ এবং আলিপুরের জনসংখ্যা হ্রাস পেলেও বৃদ্ধি পায় চিৎপুর, উল্টোডাঙা, ভবানীপুর, একবালপুর, গার্ডেনরিচ অঞ্চলে। আজকের চিড়িয়াখানার স্থানে বিশাল বস্তি উচ্ছেদ হওয়ার ফলে আলিপুরের জনসংখ্যা হ্রাস পায়[৭১]। কলকাতা শহরে প্রথম বস্তির সংজ্ঞা উল্লিখিত আছে ১৮৯৯ সালের একটি আইনে যেখানে বলা হয়েছে বস্তি হল কম করে ১০ কাঠা জমির ওপর একগুচ্ছ কুঁড়ে ঘর যা অ্যাসেসমেন্ট (Assessment) খাতায় একটি সংখ্যা হিসেবে উল্লিখিত থাকবে [৭২]। বস্তি শব্দের উদ্ভব হয় 'বসতি' থেকে যা হল অস্থায়ী কাঁচা বাড়ির দেওয়ালযুক্ত মাটির কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি। এর গঠন স্থায়ী পাকাবাড়ির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১৯ শতকে যারা কলকাতা শহরে আসে তারা বেশিরভাগই ছিল নিচু তলার মানুষ যারা বাসস্থানের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। তারা হয় জমি জবরদখল করত বা আশ্রয় নিত বস্তিতে।এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কলকাতার বেনিয়ান ও জমিদারদের কাছে কলকাতায় জমিতে বিনিয়োগ লাভজনক হয়ে ওঠে। তারা গরিব মানুষকে বস্তিতে ভাড়ার বিনিময়ে থাকতে দেয় আয়ের উৎস সন্ধানে। দেশীয়দের প্রাসাদতুল্য বাসভবন ঘিরে থাকত বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত বস্তি যা তাদের সামাজিক সম্মানকে বৃদ্ধি করত[৭৩]। এর ফলে কলকাতার অপরিকল্পিত বসতি মানচিত্রে ততোধিক অপরিকল্পিত এলোমেলো নকশা আঁকা হয়ে যায়। প্রথম থেকেই কলকাতার অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের সহাবস্থান। ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকাতেও বস্তি ছিল।

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

ক্যামাক সাহেবেরে জমিতে দক্ষিণ বস্তি ছিল প্রায় ৯ বিঘে ৫ কাঠা এলাকা জুড়ে। চৌরঙ্গী এলাকায় ২০ বিঘে ১৭ কাঠা ১৫ ছটাক জমির ওপর গড়ে উঠেছিল বিশাল মানি বস্তি [৭৪]। সাহেবরা ও দেশীয় বাবুরা ভৃত্যসঙ্গের প্রয়োজনে বস্তির সমর্থক ছিল। কিন্তু বাসস্থানের জন্য জমির জোগান, শহরের সৌন্দর্যায়ন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পৌরকর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বস্তি উচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ল। প্রথমে দক্ষিণ বস্তি ও পরে মানি বস্তি উচ্ছেদ অভিযান চলে। বস্তিবাসীদের দুরবস্থার কথা সাহেবরা চিন্তা করেনি। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সার্কুলার রোডের কাছে। অথচ ইউরোপীয়দের ভৃত্য সমস্যার কথা ভেবেই তাদের বেশি দূরে পাঠানো হয়নি[৭৫]। পরবর্তী সংস্কার হয় বামুনবস্তি যা ছিল ইউরোপীয় এলাকার বৃহত্তম বস্তি। উত্তরে থিয়েটার রোড, পূর্বে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, পশ্চিমে ক্যামাক স্ট্রিট ও দক্ষিণে লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে ঘেরা বামুনবস্তি উচ্ছেদ করে নতুন নাম হয় ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার (Victoria Square)। এছাড়া ট্রাম চলাচলের সুবিধার্থে (১৮৭৩) কিছু ছোটো অথচ জনবহুল বস্তিতে হাত পড়ে। বিডন স্ট্রিট, জোড়াসাঁকো, চোর বাগান, কলুটোলা, মুচিপাড়া, উড স্ট্রিট অঞ্চলে বস্তি উচ্ছেদ হয় মেডিক্যাল কলেজ (Medical College), সার্ভেয়ার অফিস (Surveyers Office) সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্দেশ্যে। জিরাট বস্তি উচ্ছেদ করে চিড়িয়াখানা, কড়েয়া বস্তির জায়গায় গোরস্থান, চিৎপুর বস্তি উচ্ছেদ করে ট্রাম রাস্তা, খিদিরপুর বস্তি উচ্ছেদ করে আদিগঙ্গা উন্নয়ন হয়। ক্রমশ বোঝা যায় বস্তি উচ্ছেদের বদলে উন্নয়ন প্রয়োজন। বস্তির মালিকরা বস্তি উন্নয়নের ব্যাপারে উদাসীন ছিল কারণ ক্ষয়িষ্ণু জমিদাররা আর্থিক দুরবস্থায় জর্জরিত ছিল। এদিকে বস্তির দরমার দেওয়াল, খড়ের ছাউনি বারবার অগ্নিকান্ড ঘটানোর ফলে ১৮৩৭ সালে আইন পাশ করে খড় দিয়ে ঘর নির্মান বন্ধ হয়[৭৬]।

বসতি বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য

১৮ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতায় বসতি বিবর্তনের সূচনা হয়। ১৭০৬ সালে কলকাতা শহরে পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ টি, অস্থায়ী কাঁচা বাড়ি ছিল ৮০০০ টি (সারণি-৪)। এমনকি দোতলা, তিনতলা, মাটির বাড়িও চোখে পড়ত। রাস্তাঘাট ছিল দিশি ইটের তৈরি, পুকুরের সংখ্যা ছিল ১৭। ২০ বছর পর পুকুরের সংখ্যা হয় ২৭, পাকা বাড়ির সংখ্যা হয় ৪০। সম্ভবত পুকুর খনন করে ইট তৈরি হত যা বাড়ি ও রাস্তা নির্মাণে ব্যবহৃত হত। ১৭৫৬ সালে অবশ্য দেখা যায় পুকুরের সংখ্যা কমে (১৩ টি), কিন্তু অস্থায়ী ও স্থায়ী বাড়ির সংখ্যা বাড়ে। এই সময় বাড়ি তৈরি হত চুনসুরকি গাঁথনিতে ইটের ওপর ভর দিয়ে। সম্ভবত তখন থেকেই পুকুর বুজিয়ে রাস্তাঘাট ও বাড়ি তৈরি হতে শুরু করে। সেই সময় সর্বাধিক বাসগৃহ ছিল বাজার কলকাতায়। তারপর টাউন কলকাতা ও সুতানুটি এবং সবথেকে কম গোবিন্দপুরে[৭৭]। একথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজদের হাত ধরেই আধুনিক নগর ও বাড়ির ধারণা এ দেশে আসে। সাহেবদের পাশ্চাত্য অভিজাত্যে আকৃষ্ট হয়ে কিছু দেশীয় ধনী, স্থানীয় জলবায়ু ও সংস্কৃতিকে মান্যতা দিয়ে সাহেবদের স্থাপত্য শৈলীকে অনুকরণ করে। যার ফলে কলকাতা শহরে ইঙ্গভারতীয় সঙ্কর স্থাপত্যশৈলী দেখা যায়[৭৮]। ১৭৬৮ সালে শ্রীমতি কিন্ডারসলির (Kinddersley) চিঠি থেকে তৎকালীন কলকাতার বসতির বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর মতে কলকাতা বড়ো ও সুন্দর হলেও মাদ্রাজের মত ভালো নয়। বাড়িঘর এমন অনিয়মিত যেন শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে আবার ভূপতিত হয়েছে। দুর্ঘটনা বশত প্রত্যেকে একখন্ড জমিতে নিজ রুচি ও সুবিধা মতো বাড়ি বানিয়েছে শহরের নান্দনিকতা ও নিয়মের তোয়াক্কা না করে। তাঁর চোখে সুদৃশ্য প্রাসাদের পাশে পরিচারকদের কুঁড়ে ঘর খুবই দৃষ্টিকটু। শহরের সাদা অংশই বৃহত্তম হলেও সুন্দর বাড়ির পাশে কুঁড়ে ঘর, গুদাম, ও আরো অনেক কিছু বেমানান ছিল [৭৯]।

সারণি–৪ কলকাতার জনসংখ্যা ও বসতির বিকাশ

বছর	মোট আয়তন (একর)	জনসংখ্যা (হাজার)	মোট বাড়ির সংখ্যা	পাকা বাড়ির সংখ্যা	কুঁড়ে ঘড়ের সংখ্যা
১৭০৬	১৬৯২	২২	৮০০৮	৮	৮০০০
১৭৫৬	৩২২৯	১০৫	১৪৯৪৮	৪৯৮	১৪৪৫০
১৭৯৪	৪৯৯৭	-	১৪৭৭১	১১১৪	১৩৬৫৭
১৮৫০	৪৯৯৭	৪১৩	৬২৫৬৫	১৩১২০	৪৯৪৪৫
১৯০১	১১৯৫৭	৮৪৮	১১৯৩৬৯	৪০৩৪২	৭৯০২৭
১৯৫১	১৯৪১৯	২৬৯৮	৫৯৩০০৭	-	-

*তথ্যসূত্র : মণিদীপ চ্যাটার্জী 'ক্যালকাটা দি প্ল্যানিং অ্যাগোনিস', *মিলিয়ন সিটিস অব ইন্ডিয়া*, স. আর. পি. মিশ্র, কমলেশ মিশ্র, নিউ দিল্লি, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা – ১৫১

১৯ শতকের গোড়াতেও কলকাতা ছিল কুঁড়ে ঘরের শহর। ১৮৮২ সালে কলকাতা শহরের ৬৭৫১৯ টি বাড়ির মধ্যে ১৫৭৯২ টি বাড়ি ছিল টালির ছাদ বিশিষ্ট , ৩৭৪৯৭ টি বাড়ি ছিল খড়ের ছাউনিযুক্ত, ও বাদবাকি ছিল পাকাবাড়ি। ১৮৩৭ সালে আইন পাশ হওয়ার ফলে খড়ের বাড়িগুলি টালির বাড়িতে পরিণত হয়[৮০]। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শহর জুড়ে পাকাবাড়ি নির্মাণ শুরু হয় দ্রুত হারে। গঙ্গার তীর থেকে পশ্চিমে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত বহু পাকা বাড়ি নির্মিত হয়। ১৮৫০ সালে দেখা যায় বিগত ৫৪ বছরে পাকাবাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২০০০০ এর বেশি। স্ক্যালের (Schalch) এর মানচিত্র (১৮২৫) অনুসারে শহরের উত্তর দিকে পাকাবাড়ির সংখ্যা খুব কম ছিল। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্বে শ্যামপুকুর, জোড়াবাগানের উত্তরদিক, জোড়াসাঁকো ও কলুটোলার উত্তরপূর্ব দিক ছিল জনবিরল, ঘরবাড়ি ছিল ছড়ানো ছেটানো। দেশীয়দের ঘরবাড়ি ছিল প্রধানত হুগলি নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে। কলুটোলাকে অবশ্য ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর বড়বাজারে কিছু পাকা বাড়ির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো ধমনী চিৎপুর রোডের ওপর ছিল কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রাসাদতুল্য অভিজাত অট্টালিকা, ধনী ব্যক্তিদের প্রাসাদের প্রবেশ পথ ছিল নোঙরা, তবে বাড়ির সীমানা ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় এলাকার বাড়ির স্থাপত্যশৈলী, গঠন বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

ইউরোপীয়দের বাসস্থান: সাহেবদের বাসস্থান নির্মাণের আগে স্থান নির্বাচন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সাহেব পাড়ায় জলনিকাশি ব্যবস্থা ছিল উন্নত মানের, বাড়িগুলি গ্রীকো-রোমান স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে নির্মিত ছিল। বড়ো বারান্দা , উঁচু পিলার ও বাগান ঘেরা জমি ছিল ব্যারাক ধরনের বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য[৮১]।

দেশীয়দের বাসস্থান: জনবহুল নেটিভ টাউনে (Native Town) বাস করত ধনী বাঙালিরা। এই শহুরে জমিদারদের প্রাসাদ ঘিরে থাকত বস্তি ও বাজার যা ছিল মিশ্র নাগরিক জনসমষ্টির প্রতীক। এসব মানুষ ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী, বর্ণ ও পেশাধারী। এখানে দুই ধরনের বসতি দেখা যেত।

১)বাবুদের বাসস্থান: দেশীয় এলাকায় বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল এক সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপত্য শৈলী। উপযুক্ত নকশা করা সদরযুক্ত বাড়িগুলো হত দোতলা বা তিনতলা। সরু রাস্তার দুপাশে শ্রেণিবদ্ধ বাড়িগুলির 'রক' ছিল

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

প্রতিবেশীদের প্রাতিষ্ঠানিক আড্ডার জায়গা। বাড়ির কেন্দ্রস্থলে থাকত এক বিরাট খোলা উঠোন, যাতে চারপাশের ঘরগুলো যথেষ্ট আলোবাতাস পায়। বাড়ির ছাদগুলি ছিল সমতল ও সিঁড়িযুক্ত। বাড়িগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল। বাড়ির একতলার তিনদিক ব্যবহৃত হত ভাঁড়ার ঘর ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে, উত্তরদিকে থাকত ঠাকুর ঘর। অন্দরমহলে ছিল মহিলাদের থাকার বন্দোবস্ত। সেখানে ছোটো উঠোন ও ছোটো বারান্দা থাকত বাড়ির ভিতরের দিকে[৮২]। বর্তমানে উত্তর কলকাতার প্রাচীন বাড়িগুলি এই নিদর্শন বহন করছে।

২) গরিব মানুষের বাসস্থান : গরিব মানুষ বাস করত কুঁড়ে ঘরে। দেওয়াল তৈরি হত খড় ও টালি দিয়ে, বাড়িগুলি নির্মিত হত নিচু খালি জমির ওপর বা স্যাঁতস্যাঁতে কাদা মাটির ওপর। বাড়িগুলি গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যা প্রায়ই জলবন্দি অবস্থার সম্মুখীন হত[৮৩]।

লটারি কমিটির উদ্যোগে জমি উন্নয়ন ও নগরোন্নয়নের ফলে ১৯ শতকে শহরে সম্পত্তি গড়ে তোলার ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখা যায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। জমি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছিল গরিব মানুষের বাসস্থানের ওপর। সাহেবদের বাসস্থানের জন্য চৌরঙ্গীর সুবিশাল অট্টালিকার সারির পিছনে গরিবদের কুঁড়ে ঘরগুলি ভাঙা পড়ে। জমির উন্নয়ন ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে শহরের ভূস্বামীরা এতটাই লাভবান হয় যে তাদের শ্রমবিমুখ পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম এই জমির উচ্চমূল্য ও চাহিদার জন্য ঘরবাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি করে অর্থ সংকট থেকে রেহাই পেয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বাসস্থানের চাহিদা বাড়তে থাকে শহরে। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি পায় পাকা বাড়ির সংখ্যা । সেই সঙ্গে বদলে যেতে থাকে নির্মাণের পদ্ধতি ও শৈলী। কোথাও কোথাও কাঁচা বাড়ির সংখ্যা পাকা বাড়ির সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯০১ সালে জনগণনা অনুসারে শহরের মোট জনসখ্যার ৬০% বাস করত এই সব অস্থায়ী বাড়িতে[৮৪]। জোড়াবাগান, বড়বাজার, পদ্মপুকুর , ওয়াটারলু স্ট্রিট ও পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে পাকা বাড়ির আধিক্য চোখে পড়ে। বোঝাই যায় অবস্থাসম্পন্ন 'বাবু' অথবা শ্বেতাঙ্গরা বাস করত এইসব এলাকায়। অন্যদিকে, কলুটোলা, শ্যামপুকুর, মুচিপাড়া, বেলেঘাটা, একবালপুর ইত্যাদি গরিব নেটিভ অধ্যুষিত এলাকায় অস্থায়ী বাড়ির সংখ্যাই ছিল বেশি। বিশ শতকের গোড়াতেও কলকাতার আংশিক গ্রাম্য চেহারা বজায় ছিল। পরবর্তী দশকগুলিতে এই ছবি দ্রুত বদলে যায়। অস্থায়ী ঝুপড়ির জায়গায় গড়ে ওঠে তিন / চার তলা সমান পাকা বাড়ি, পাশাপাশি প্রাসাদসম অট্টালিকা। স্থাবর সম্পত্তির ব্যবসা লাভজনক হয়ে ওঠায় জমির দাম রাতারাতি বৃদ্ধি পায়, সেই সময়ও শহরের প্রাণকেন্দ্রে গৃহনির্মাণের জন্য ফাঁকা জায়গার অভাব চোখে পড়ে। জমির অভাব, জমির চাহিদা ও দামকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ফলে তৈরি হয় এক নতুন সমস্যা - জনাধিক্য। ১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে শহরের মোট জনসংখ্যার ৮৯.৩৩ শতাংশ মানুষের জন্য মাথা পিছু একটি ঘরের মাত্র ৩/৪ অংশ বরাদ্দ ছিল[৮৫]। স্বাভাবিক কারণেই জনাধিক্যের পাশাপাশি বাসস্থানের সংকট বিশ শতকের কলকাতার অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অবশ্য নতুন গৃহনির্মাণে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাছাড়া ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (Calcutta Improvement Trust) এই সময় কিছু পুরোনো জীর্ণ বাড়ি ভেঙে ফেলে। বাসস্থানের জোগান কমে যাওয়ায় জমির দাম ও বাড়ি ভাড়া লাফিয়ে বাড়তে থাকে, যার মাসুল দিতে হয় কালা ফিরিঙ্গি (Callah Feringhee) বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান (Anglo Indian) আরা দেশীয়দের। বাড়ির মালিকরা এই সুযোগে একই ছাদের তলায় একাধিক পরিবারকে ভাড়া দিতে থাকে। একই বাড়ির বিভিন্ন তলায় বা পাশাপাশি ঘরে অনাত্মীয় পরিবারগুলি একই পরিকাঠামো (পানীয় জল, কলতলা, শৌচাগার, ছাদ, সিঁড়ি, বারান্দা) ব্যবহার করে। এক উঠোন বারো ঘরের ধারণা তৈরি হয়, ১৯১৯ সালের সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী মাত্র দুটি ঘরে বাস করতে দেখা যেত এমন পরিবারকে যার সদস্য সংখ্যা ১৪। পুরোনো বাড়িগুলি দ্রুত সংস্কার করে মালিকরা যথাসম্ভব বেশি 'ভাড়াটে' দের বাসস্থানের জোগান দেয়[৮৬]। নতুন গৃহনির্মাণেও বাড়ির মডেলে (Model) পরিবর্তন আসে।

স্বল্প জায়গায় বেশি মানুষের বসবাসের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। এক্ষেত্রে বোর্ডিং হাউস, মেস বাড়ির ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, একই বাড়িতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভাষাভাষী পরিবার পাশাপাশি একত্রে বাস করছে এটা সম্ভব হয় কলকাতার বুকেও। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য শ্রমিক আবাসনও গড়ে উঠতে থাকে।

বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ ও জমির চাহিদার সাঁড়াশি আক্রমণে জমির দাম ও বাসস্থানের সংকট বাড়তে থাকে। বাসস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার সমাধানে ১৯১৯ ও ১৯২৩ সালে দুটি কমিটি (Committee) গঠিত হয়। ১৯২৩ সালে গঠিত 'দি ক্যালকাটা হাউসিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিটি' (The Calcutta Housing and Communicatin Committee) কলকাতায় বিদ্যমান বাসস্থানের ওপর জমির মূল্য ও জমিবন্টন ব্যবস্থার প্রভাব ও উন্নয়নের প্রভাব, সাধারণ মানুষের বাসস্থানের স্বপ্নপূরণের জন্য সম্ভাব্য আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে। মধ্যবিত্ত ভারতীয় ভদ্রলোক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান (Anglo Indian) পরিবারের জন্য সম্ভাব্য সস্তা আবাসিক অঞ্চল সন্ধান করে, যাতে কর্মক্ষেত্রে ও বাড়ির মধ্যে যাতায়াত সাধারণের সাধ্যের মধ্যে থাকে। কলকাতার জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাপনের মানের ওপর ভিত্তি করে কমিটি চারটি বিভাগে ভাগ করে। এগুলি হল –

ক) মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবার যার বাড়ির একাংশে 'ভাড়াটে' অথবা একতলায় দোকানঘর।

খ) বস্তি অথবা কুঁড়ে ঘরে বাস করা ভাড়াটে পরিবার।

গ) মাসিক ১৫০-৩০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়ার ফ্ল্যাটে বাস করা অভিজাত ইউরোপীয় পরিবার।

ঘ) ছোটো বাড়িতে বসবাসকারী ভাড়াটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান (Anglo Indian) পরিবার।

সমীক্ষার শেষে কমিটি মতামত দেয় যে, সনাতনী ভারতীয় যৌথ পরিবারের বাসযোগ্য বড়ো বাড়ি কলকাতা শহরে নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফলে স্বল্প জায়গায় অনেক মানুষকে বাসস্থান জোগান দিতে হলে ন্যূনতম জায়গা প্রদান করতে হবে। তাদের মতে একটি ছোটো ভারতীয় পরিবারের জন্য একটি বারান্দা, পাকা টালির ছাদযুক্ত ৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্লিনথ (Plinth) অঞ্চল, 10" পুরু দেওয়াল, একটি রান্নাঘর ও আউট হাউস (Out house) সহ মোট ৪ কামরার একটি বাড়ি যথেষ্ট। এই ধরনের বাড়ির জন্য কলকাতা শহরে ৩ কাঠা ও শহরতলিতে ৫ কাঠা জমি বরাদ্দ করা হয়, যেটা তৈরি করতে ন্যূনতম ৪০০০-৫০০০ টাকা ধার্য করা হয়। অন্যদিকে ইউরোপীয়দের বাসস্থানের জন্যও পূর্বের বিশালাকৃতির বাড়ি নাকচ করে দেওয়া হয়। পৌর আইন অনুযায়ী ঘরের উচ্চতা নির্ধারিত হয় ১০.৫ ফুট। উৎকৃষ্ট আলো, হাওয়াযুক্ত অপেক্ষাকৃত ছোটো ঘর ও বারান্দাওয়ালা বাড়ি ইউরোপীয়দের জন্য অনুপযুক্ত হলেও অর্থনৈতিক কারণে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জমির মূল্য ছাড়াও পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন ছিল। ভারতীয়দের জন্য ছোটো বাড়ি বাবদ ১০,০০০ টাকা, মধ্যবিত্ত মানের বাড়ি ৩০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা এবং ইউরোপীয়দের বাসগৃহ নির্মাণে ৩৫,০০০-৮০,০০০ টাকা প্রয়োজন ছিল। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে বিশ্ব অর্থনীতির অস্থির ও মন্দা পরিস্থিতির জেরে ভারতে যুদ্ধের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব, খরা পরিস্থিতি, একই সঙ্গে কালোবাজারি করে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে হঠাৎ আসা উদ্বৃত্ত অর্থ জমির চাহিদা, মূল্য, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য ও শ্রমের মূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে শহরে জমির মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসস্থানের সংকট সৃষ্টি হয়[৮৭]। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জমির দর বিভিন্ন মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। উত্তর কলকাতায় অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি না হলেও মধ্য কলকাতার বড়বাজার এবং দক্ষিণ কলকাতার বাজার অঞ্চলে জমির দাম হু হু করে বৃদ্ধি পায়। কালা সাহেবরা সম্ভবত সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এর ফলে। যদিও এই মূল্যবৃদ্ধির সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি তবু এটা

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

অনুমেয় যে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি ছিল স্বাভাবিক। এমনকি কোথাও কোথাও ১০০ শতাংশ বা তার বেশি বৃদ্ধিও দেখা দিয়েছিল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কালোবাজারিদের হাত ধরে বেশ কিছু সম্পত্তি হাত বদল হয় এই সময়[৮৮]। ১৯১৯ সালে গঠিত কমিটি কলকাতায় জমির ভাড়া ও মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ণয় করেছিল।

১. সাধারণ: অন্যান্য বড়ো শহরের মতোই দীর্ঘদিন ধরে একটি স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, জমির দাম বাড়ার একটি সাধারণ কারণ। ইতিহাস বলে বছরে জমির ৫% মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক। কলকাতা শহর সমৃদ্ধশালী হতে হতে কায়াবৃদ্ধি করে, কিন্তু চারপাশের অস্বাস্থ্যকর শহরতলির জন্য বেশিদূর বিস্তৃত হতে পারে না। প্রতিবছর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, ত্রুটিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালী, অপর্যাপ্ত জল সরবরাহ, আদর্শ যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য শহরতলি শহরের মানুষকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ফলে জনসংখ্যার চাপে শহরে জমি, বাড়ি, সম্পত্তির দাম আকাশছোঁয়া হতে থাকে। উপরন্তু গ্রাম/শহরতলির অভিজাত ধনীরা শহুরে সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় শহরে স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। উত্তর কলকাতার বনেদী পরিবারের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি রক্ষার তাগিদ ও কিছু পরিবারের সচলতার অনীহা ঐ অঞ্চলের জমির দাম ও বাড়ি ভাড়া বহু গুণ বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে।

২. যুদ্ধকালীন ফাটকা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশেষ করে ১৯১৮-১৯১৯ সালে কলকাতার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত কাঁচা টাকার জোগান থাকায়, ভবিষ্যতে লাভের আশায় জমি ও বাড়ি কিনে স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে। ফলে কিছুটা কৃত্রিমভাবে জমি বাড়ির চাহিদা সৃষ্টি হয় ও মূল্য বৃদ্ধি পায়।

৩. অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি: যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, কলকাতায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজরা বেশ কিছু শিল্প স্থাপন করে। ফলে ভবিষ্যতে কলকাতায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আশায় জমির চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পায়।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম ও শহরতলি থেকে যেমন দেশীয়রা শহরে ভিড় করতে থাকে তেমনি যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় ও জাপানিদের একটা সাময়িক অন্তঃপ্রবাহ দেখা যায়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ জমির চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৫. গৃহনির্মাণে ব্যয় বৃদ্ধি: গৃহনির্মাণ ও মেরামতির খরচ, কাঁচামালের দাম, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, বাড়ি ভাড়া ও দামবৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল বলে মনে করা হয়।

৬. সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি: অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জমির দাম বৃদ্ধি পায়। কারণ সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে জমির মালিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ভাড়া/দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য এটাই প্রত্যাশিত।

৭. শহরতলির উন্নয়নে মন্থর গতি: শহর কলকাতার পাশাপাশি কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা (১৯১১) শহরতলিতেও জমি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শহরতলির উন্নয়নের হার মন্থর হওয়ায় কলকাতা শহরে মানুষের অভিবাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মানিকতলা অঞ্চল উন্নয়নের জন্য কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা ১৯১২ সালে আবেদন জানায় যা বাস্তবায়িত হতে ৭ বছর সময় লাগে।

৮. উদ্বৃত্ত জমি নিলাম: কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা ও কলকাতা পৌর সংস্থা দ্বারা উদ্বৃত্ত জমি নিলামে বিক্রি করে দেওয়ার পদ্ধতিকে অনেকেই কলকাতা শহরে জমির দাম নিয়ে কালোবাজারি ফাটকা খেলা ও জমির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেন। কিন্তু কমিটির মতে সেই মুহূর্তে উদ্বৃত্ত জমিকে খোলা বাজারে বিক্রি করার আর কোন নিরাপদ উপায় উন্নয়ন সংস্থা ও পৌর সংস্থার হাতে ছিল না।

৯. অন্যান্য: বিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় জমির মূল্যবৃদ্ধির অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলি হল-

. জমিতে মূলধন বিনিয়োগের ফলে সুদের হার সম্পর্কে মানুষের ধারণার অভাব।

. জমির ভাড়া থেকে প্রাপ্ত সুদের প্রতি জমিদারদের আকর্ষণ

. নিরাপদ বিনিয়োগ হিসাবে জমির আকর্ষণ ।

.জমি থেকে অতিরিক্ত মুনাফার প্রত্যাশা।

.ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গৃহনির্মাণ ও স্থাবর সম্পত্তির সংস্থানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

.ভারতীয় পরিবারের একত্রে পাশাপাশি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে বাস করার প্রবণতা।

.শহরের প্রান্তদেশের বদলে প্রানকেন্দ্রে সরকারি বাড়ি ও সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন।

.অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন ও জনবহুল বাড়িতে বসবাসের সন্তোষজনক মানসিকতা।

.পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের অত্যাধিক ব্যয়ের কারণে প্রান্তীয় অঞ্চলে বসতি নির্মাণের জনপ্রিয়তার অভাব।

কমিটির মতে এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সমাধানের একমাত্র প্রত্যক্ষ সমাধান ছিল শহরতলিগুলির দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শহরের মধ্যে ও বিশেষ করে শহরের সঙ্গে শহরতলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে জনঘনত্বকে হ্রাস করা। ১৯১৯ সালে গঠিত জমির মূল্য সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির মতে নতুন আইন গঠন করে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বসতি উচ্ছেদ করে বিকল্প বাসস্থানের জোগান দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করে।

১. সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন লাগু করা হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল সেইসব সম্পত্তি যা এই নতুন আইন প্রণয়নের সময় বা পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে।

২. প্রাথমিকভাবে এই আইন প্রণয়নের পরে ৩ বছর ও পরে প্রয়োজন হলে ক্ষেত্র বিশেষে ২ বছর পর্যন্ত বলবৎ করা যেতে পারে।

৩. আইনটি কলকাতা পৌর সংস্থা, হাওড়া, মানিকতলা, কাশীপুর, চিৎপুর, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, সাউথ সাবআরবান (South Subarban) পৌরসভা অঞ্চলে প্রণয়ন করার কথা বলা হয়[৮৯]। ১৯২৩ সালে হাউসিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিটি (Housing and Communication Committie) উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ল্যান্ড আয়কুইজিশন অ্যাক্ট (Land Acquisition Act) নামে প্রণয়নের পক্ষে মত দান করে[৯০]। এছাড়াও কিছু অপ্রত্যক্ষ উপায়ে জমির দাম নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। যেমন-

১. সমবায় বাসস্থানের নির্মাণের সম্ভাবনা পর্যালোচনা ।

২. লিজ (lease) দেওয়া জমিতে নতুন বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা।

৩. গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাঙ্কে সম্পত্তি বন্ধক (mortgage) রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ।

৪. সম্পত্তি বিনিময় প্রথার সূচনা করে জমির মান নির্ধারণ।

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

৫. নতুন জমি উদ্ধার, অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা ও পৌর সংস্থার চাপ লাঘব করতে পাবলিক ওয়ার্ক কনফারেন্সের (Public work Conference) আয়োজন।

৬. শহরতলিগুলিতে জমি উন্নয়ন, অন্যান্য পরিকাঠামো ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য একটি উন্নয়ন সংস্থা নির্মাণ।

৭. কলকাতার জনসংখ্যার চাপ কমাতে শহরের আশেপাশে জমি অধিগ্রহণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়ে তোলার প্রস্তাবনা। এই উদ্দেশ্যে মোটামুটি ১০০০ বিঘা জমিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলি যেমন- টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, তিলজলা, কাশীপুর, চিৎপুরের পূর্বদিক, দমদম, হাওড়ার রেললাইনের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়।

৮. বাড়ি তৈরি করার আগে ঐ সব অঞ্চলে প্রয়োজনীয় পয়ঃপ্রণালী জল নির্গমন ও সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়া রাস্তাঘাট, উন্মুক্ত অঞ্চল সহ অন্যান্য সমস্ত পরিকাঠামোর উপযুক্ত ও যথাযথ মানচিত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব উন্নয়ন সংস্থাকে প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিটি প্লটে নির্মিত বাড়ির শ্রেণিসংখ্যা নির্ধারণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

৯. উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক জোগানের উৎস হিসেবে করারোপের পরিবর্তে ঋণদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১০. জমি অধিগ্রহণ আইনের অন্তর্গত জমি, আবাসন নির্মাণের উদ্দ্যেশ্যে চিহ্নিত সংস্থাকেই ব্যবহার করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।

১১. কমিটির সদস্যরা কলকাতার দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধানে একটি নগর পরিকল্পনা আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

১২. সমস্ত নতুন জমি, বাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত হলে , রাস্তাঘাট ও উন্মুক্ত অঞ্চল বাদ দিয়েও বাসগৃহের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশিত ছিল।

১৩. কলকাতার সরকারি উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে কেবলমাত্র স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড (Stand Bank Road) অঞ্চল সম্পূর্ণ ভাবে গৃহ নির্মাণে বরাদ্দ করার প্রস্তাব ছিল।

১৪. সরকারি কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প নির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি যুগ্ম উদ্যোগের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

১৫. মধ্য কলকাতার সমস্ত কারখানাগুলি প্রান্ত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে ঐ স্থান আবাসনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও শহরের মধ্যভাগে কোনো কারখানা গড়ে তোলার অনুমোদন প্রদানে কলকাতা পৌরসংস্থাকে বিরত থাকতে বলা হয়।

১৬. কমিটি টাকশাল, রেলবগি বাছাই কেন্দ্র ইত্যাদি শহরের প্রান্ত অঞ্চলে স্থাপনের পরামর্শ দেয়।

১৭. হাওড়া সহ আরোও কয়েকটি পৌরসভাকে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়।

১৮. সবশেষে, শহরের অপেক্ষাকৃত গরিব কুলিমজুর সম্প্রদায়ের মানুষকে অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি বাসস্থানের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে শিক্ষাদানের পরামর্শ দেওয়া হয়[৯১]।

১৯ শতকে কলকাতা শহরে যে আবাসিক পৃথকীকরণ দেখা যেত বিশ শতকে এসে তা অনেকটা মলিন হয়ে গেল। মধ্যবর্তী মিশ্র অঞ্চলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান, এবং অবাঙালিদের বাসস্থান গড়ে উঠল। শ্বেতাঙ্গদের 'সাদা কলকাতা' অঞ্চলেও ভারতীয়রা বাস করতে শুরু করল। প্রধানত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল শ্যামপুকুর,

জোড়াসাঁকো, কুমোরটুলি, কালীঘাট ও টালিগঞ্জ এলাকা। অন্যদিকে অবাঙালিদের প্রাধান্য ছিল বড়বাজার, জোড়াবাগান ইত্যাদি এলাকায়। কিন্তু ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে এই আঞ্চলিকীকরণ খুব সুনির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ শহর কলকাতা ধীরে ধীরে তিলোত্তমা হয়ে উঠছিল ও আধুনিক নগরীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশ্বজনীন বা কসমোপলিটান (Cosmopolitan) রূপ ধারণ করছিল। দেখা যাচ্ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত পাড়ায় অবাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে মাড়ওয়ারিরা অনুপ্রবেশ করছিল। এছাড়া ছিল পাঞ্জাবি, গুজরাটি, তামিল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ। উত্তর কলকাতার দীর্ঘদিনের বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার ক্রমশ দক্ষিণে সরে আসতে শুরু করেছিল। কালীঘাট, আলিপুর, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে বাঙালিরা জমি কিনে বাস করতে শুরু করল। সম্ভবত উত্তর ও মধ্য কলকাতা থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রত্যাহার শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন কারণে। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি ওয়ার্ডগুলির তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার অপেক্ষাকৃত আলো হাওয়াযুক্ত খোলা অঞ্চল আকর্ষণীয় ছিল। উত্তর কলকাতার পুরোনো বনেদী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে বিলাসবহুল ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা সম্ভব ছিল না, ফলে পৈত্রিক সম্পত্তি বিত্তশালী মাড়ওয়ারিদের হাতে বিক্রি করে দক্ষিণ শহর ও শহরতলি অঞ্চলে সস্তায় জমি কেনা লাভজনক ছিল। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি যেমন- হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এমনকি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, খুলনা, যশোর থেকেও বাঙালিরা নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে কলকাতার অপেক্ষাকৃত কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অভিবাসন করতে শুরু করে। কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা ক্রমাগত বাঙালিদের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে থাকে কিন্তু শহরের নতুন গড়ে ওঠা এলাকা মধ্যবিত্ত বাঙালির ক্রয়ক্ষমতার বাইরেই থেকে যায়। মধ্যবিত্ত বাঙালি নতুন গড়ে ওঠা উপনগরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের এই ব্যবস্থাপদ্ধতি আজকের কলকাতা শহরেও বর্তমান। বিশেষজ্ঞদের মতে জাত ব্যবসায়ী মাড়ওয়ারি গোষ্ঠী শহরের স্থাবর সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে। বড়বাজারেও তাদের আধিপত্য থাকায় শহরের অর্থনীতির চাবিকাঠি অনেকটাই তাদের হাতে চলে যায়। তারা শহরের দক্ষিণ অংশে বাঙালি অধ্যুষিত কালীঘাট, আলিপুর, টালিগঞ্জ, কেয়াতলা, গড়িয়াহাট, গড়চারোড, হাজরা রোড, রসা রোড, ভবানীপুর এমনকি তথাকথিত 'সাদা শহরেও' প্রবেশ করে। মধ্যবিত্ত বাঙালি পিছু হটতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আকস্মিক বাণিজ্যিক বৃদ্ধি এই প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করে। সেসময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো গজিয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদবাস্তু সমস্যা। ১৯ শতকের শেষদিকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার জনাধিক্যের কারণে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, কালীঘাট, খিদিরপুর, চেতলা ও পূর্বে খাল ধারে জনসংখ্যার অকল্পনীয় চাপ দেখা দিয়েছিল। বিশ শতকের তিরিশ এবং চল্লিশ-এর দশকে কলকাতা সাক্ষী থাকে সাধারণ মানুষের বাসস্থান সংকটের। এর ফলে উত্তর কলকাতা, শহরতলি বা রাজ্যের অন্য জেলা থেকে স্থানান্তরিত বাঙালি পরিবার যারা ভবানীপুর থেকে গড়িয়াহাট অঞ্চলে বাস করছিল তারা আরও দক্ষিণে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া পর্যন্ত স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হল। কলকাতার ভূমির ব্যবহার দেখলে বোঝা যায় কলকাতা একটি আবাসন কেন্দ্রিক শহর। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে বস্তির সংখ্যা কমতে দেখা যায় (সারণি-৫)। তার মানে কিন্তু এই নয় যে শহরে বাসস্থানের সংকট হ্রাস পায় বা গরিব মানুষ পাকা বাড়িতে বাস করতে শুরু করে। বরং এর কারণ হিসাবে বলা যায় নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য ক্রমাগত শহরের কেন্দ্র থেকে বস্তি উচ্ছেদ করতে থাকে। অসহায় গরিব মানুষ ভিড় করতে থাকে শহরের প্রান্তীয় অঞ্চলে। কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা এলাকার বাইরে টালিগঞ্জ অঞ্চলে মাথা তুলতে শুরু করে বস্তির কুৎসিত ও অস্বাস্থ্যকর চেহারা[৯২]।

সারণি-৫ শহরে পাকাবাড়ি ও বস্তির শতকরা হার (১৯২১-১৯৫১)

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

বছর	পাকাবাড়ি	বস্তি
১৯২১	৮৯	১১
১৯৩১	৯২	৮
১৯৪১	৯৩	৭
১৯৫১	৯৬	৪

*তথ্যসূত্রঃ *ভারতীয় জনগণনা প্রতিবেদন ১৯৫১*, ৬ নম্বর সংখ্যা , তৃতীয় ভাগ, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১-১৮

উপসংহার

মূলত একটি ঔপনিবেশিক ও আরেকটি অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়ে কলকাতা প্রথম থেকেই উন্নত ও অনুন্নত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে অনুন্নত কলকাতায় নাগরিক পরিষেবার ঘাটতি ছিল প্রত্যাশিত[৯৩]। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৪৩ সালের আর্থিক মন্দা, ১৯৪৪ সালের মহামারী, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যা। ১৯৩০ সালের পর কলকাতার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছিল দক্ষিণদিকে অনুভূমিক ভাবে[৯৪]। পুরোনো জীর্ণ বাড়িগুলি একদিকে সংস্কারের অভাবে ধুঁকছিল, উপরন্তু উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার চাপে নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর, আলো-হাওয়া-জলহীন পরিবেশেও সাধারণ মানুষ কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্য শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বাস করতে পছন্দ করত। কোন সুনির্দিষ্ট আবাসন নীতি না থাকায় বিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা একটি নাগরিক দুর্দশার সম্মুখীন হয় ও কলকাতার বসতি মানচিত্রে একটি অনন্য নকশা রচিত হয়।

মানচিত্র ১ : ১৮ শতকে হুগলি উপত্যকা অঞ্চল

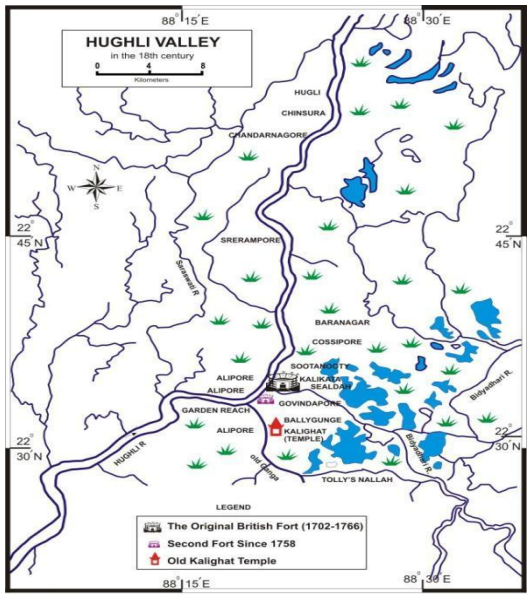

সূত্র: প্রদীপ সিনহা, *ক্যালকাটা ইন আরবান হিস্ট্রি* , কলকাতা, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা – ১

মানচিত্র ২: কলকাতা শহরের আবাসিক বিভাজন(১৮৫০)

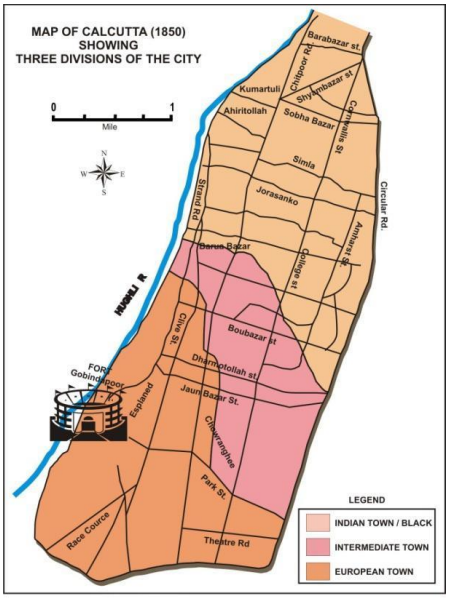

সূত্র: প্রদীপ সিনহা, *ক্যালকাটা ইন আরবান হিস্ট্রি* , কলকাতা, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা – ১২

তথ্যসূত্র

১. *Census of India, HH series, District Census Handbook*, Kolkata, Government of India, 2011, page 25

২. S.K. Munsi, *Dynamics of Urban Growth in Eastern India, Kolkata*, Thema, 2011, page 18

৩. *Census of India, op.cit*, page 9

৪. বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, বাকসাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৬৯৭

৫. সত্যেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, *বাংলায় বসতি বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৫-৭

৬. Calcutta Improvement Trust, *The Origin and Growth of Calcutta*, Calcutta, CIT, 1974, page 2

৭. *ibid*

৮. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা কমলালয়,* স. বিষ্ণু বসু, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশনা, ১৮২৩, পৃষ্ঠা ২১

৯. Calcutta Improvement Trust, *Op.cit*, page 2

১০) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, 'সেকালের কলকাতার বাড়ি ঘর দোর', প্রবন্ধ, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৭ মার্চ, ২০০৪, কলকাতা, বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র পৃষ্ঠা –১

১১) Calcutta Improvement Trust, *Op.cit* , page-2

১২) S.K Munsi, *Op.cit*, Page – 2

১৩) Calcutta Improvement Trust, *Op.cit* , page-3

১৪) রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, ইতিহাস গ্রন্থমালা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৯৫

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

১৫) Nishit Ranjan Roy, *Calcutta : The Profile of A City*, Calcutta, K.P Bagchi and Company, 1986, Page – 58.

১৬) নিখিল সুর, *কলকাতার নগরায়ণ, রূপান্তরের রূপরেখা (১৮০৩-১৮৭৬),* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা – ২০

১৭) *Census of India*, 2011, *op.cit*, page – 11

১৮) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা – ২০

১৯) *তদেব*

২০) *Census of India*, 2011, *op.cit*, page – 11

২১) *তদেব*

২২) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা – ২২

২৩) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ২৭

২৪) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page-9

২৫) *ibid*, page – 5

২৬) *Census of India*, 2011, *op.cit*, page – 13

২৭) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page-12

২৮) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা – ৬৫

২৯) *তদেব*

৩০) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৬৮

৩১) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৪৫

৩২) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৮৩

৩৩) *Census of India*, 2011, *op.cit*, page – 1

৩৪) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page- 9

৩৫) *Select Documents on Calcutta 1800-1900*, Kolkata, Directorate of State Archives, Higher Education Department, Government of West Bengal, 2011, page – 2

৩৬) *ibid*, page - 4

৩৭) *ibid*, page - 94-102

৩৮) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page- 10

৩৯) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা – ৮

৪০) *Census of India*, Volume VI, Part – III, Calcutta, Directorate of Census Operation, West Bengal, Government of India, 1951, page – 74-90

৪১) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা – ৭২

৪২) *তদেব*

৪৩) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৭৮

৪৪) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page- 11

৪৫) Pradip Sinha, *Calcutta in Urban History*, Calcutta Firma KLM Private limited. 1978, Page – 7

৪৬) *ibid*, page –5

৪৭) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা – ৬৬

৪৮) *তদেব*

৪৯) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা –১

৫০) *Select Documents on Calcutta 1800-1900, op.cit*, page 1

৫১) Pradip Sinha, *op.cit.* Page – 5
৫২) *Ibid*, Page 6
৫৩) James Renald Martin, 'Extract From Notes on Medical Topography of Calcutta, *Census of India*, Appendix, Calcutta, Directorate of Census Operation West Bengal, Government of India, 1951, Page – 41-42
৫৪) Pradip Sinha, *op.cit.* Page –9
৫৫) *ibid,* Page 38
৫৬) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা – ৭০
৫৭) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page- 10
৫৮) Pradip Sinha, *op.cit.* Page –37
৫৯) *ibid*, Page 38
৬০) *ibid*, Page 37
৬১) James Renald Martin*, op.cit.* Page –41,42
৬২) Pradip Sinha, *op.cit.* Page –59
৬৩) *ibid*, Page 60
৬৪) নিখিল সুর, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা – ৬৭
৬৫) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৭০
৬৬) Pradip Sinha, *op.cit.* Page –16
৬৭) *ibid*, Page 60
৬৮) *ibid*, Page 54
৬৯) নিখিল সুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৭১
৭০) *তদেব*
৭১) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ৭৮
৭২) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৩৬
৭৩) *তদেব*
৭৪) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৩৭
৭৫) *তদেব*, পৃষ্ঠা – ১৩৮
৭৬) *তদেব,* পৃষ্ঠা – ১৪১
৭৭) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা – ১
৭৮) Calcutta Improvement Trust, *op.cit* , page- 7
৭৯) *ibid*
৮০) Pradip Sinha, *op.cit.* Page –28,29
৮১) *Census of India*, 1951, *op.cit*, page – 51, 52
৮২) James Renald Martin, *op.cit*, Page - 41, 42
৮৩) *ibid*
৮৪) *Census of India*, 1951, *op.cit,* page – 74- 90
৮৫) *ibid*
৮৬) *Report of the Calcutta Housing and Communication Committee 1923*, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Report, 1924, Page – 1-3
৮৭) *ibid*, Page – 4-9

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427505

৮৮) *Report of the Committee Appointed to Enquire into the Land Values and Rents in Calcutta 1919*, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Report, 1920, Page 6

৮৯) *ibid*, Page – 2-7

৯০) *Report of the Calcutta Housing and Communication Committee 1923, op.cit*, page 6-9

৯১) *Report of the Committee Appointed to Enquire into the Land values and Rents in Calcutta 1919*, *op.cit* , page – 6

৯২) *Census of India, 1951*, *op.cit,* page – i-xviii

৯৩) Pugh Cedric, *Housing of Urbanisation, A study of India,* New Delhi, Sage Publications, 1990, page -201

৯৪) *Census of India,* 1951, *op.cit,* page – i-xviii